এই সময়
সংবাদপত্র

কথা স রি ৎ

জনসমাজে স্বাধীন ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি য়ুরোপে টাকার থলি একটা পূজার বেদী অধিকার করিবার উপক্রম করিতেছে সন্দেহ নাই।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপরীত

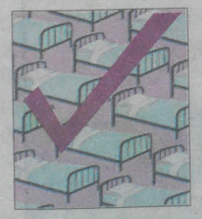

যে কোনও মহামারী বা অতিমারী প্রতিরোধের অন্যতম পূর্বশর্ত— স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রসার ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন, যেন সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ চিকিৎসা পেতে পারে। দুর্ভাগ্য, ভারতের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেটিতে যত না তৎপর, তার থেকে বেশি উদ্যোগী নানাবিধ নিয়মকানুন এবং বাধানিষেধের শৃঙ্খল নির্মাণে। তারই সাম্প্রতিক নজির দিল্লি। দিল্লি মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দিল্লির সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীশয্যা সংরক্ষিত থাকবে সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য। অস্যার্থ, যারা শহরে নবাগত, যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের অস্থায়ী বাস সেই শহরে হওয়া সত্ত্বেও যাদের প্রমাণপত্র নেই এবং যারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁরা বঞ্চিত হবেন দিল্লির স্বাস্থ্য-পরিষেবা থেকে। সৌভাগ্যবশত, দিল্লির লেফটেনান্ট-গভর্নর সিদ্ধান্তটিকে নাকচ করেছেন। প্রথমত, দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া অধিকার সকলেরই। দ্বিতীয়ত, কোনও রোগাক্রান্তকে চিকিৎসার আওতার বাইরে রাখার অর্থ অন্য নাগরিকদের মধ্যে সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি। অতএব এই জনমোহিনী রাজনীতির ফাঁদে না পড়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত কী ভাবে সর্বাধিক মানুষের কাছে চিকিৎসার সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটি নিশ্চিত করা।

ইতিমধ্যেই সারা দেশে হাসপাতালে রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে বেসরকারি পরীক্ষাগারের অনেকগুলিতে বাধানিষেধ জারি হয়েছে, উপসর্গহীন রোগীর ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ টেস্ট হয়নি। অর্থাৎ, পরিকাঠামো বিস্তারের পরিবর্তে আমলাতন্ত্র মনোনিবেশ করেছে নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মবিধি জারি করায়। একই হাসপাতালে কোভিডে আক্রান্ত এবং আক্রান্ত নয়, এই দুই ধরনের রোগীদের পৃথক ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে। জরুরি হল, বৃহৎ মাত্রায় কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য সুনির্দিষ্ট অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা। উল্লেখ্য, ইতালি, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে এই ধরনের হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। মুম্বই পরিকল্পনা করেছে এই ধরনের হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। মুম্বই পরিকল্পনা করেছে এই বৃহদাকার চিকিৎসাকেন্দ্রে আরও ৮ হাজার রোগীশয্যা যোগ করা হবে। একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে অন্যান্য শহরগুলিকেও। এই মুহূর্তে দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। বহু রাজ্যে পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়। এখনও ভারতে রোগনির্ণয়ের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম। অবিলম্বে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ছাড়া নান্যপন্থা।

মুক্তি

নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁরা করোনা-মুক্ত দেশ। শেষ যে ব্যক্তি সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। দেশে আর কোনও সংক্রমণের নতুন ঘটনার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ রকমটাই হওয়ার কথা ছিল, এবং এ রকমটাই যে স্বাভাবিক, সে কথাটি বেশিরভাগ মানুষ ভুলতে বসেছিলেন। সেটা অবশ্য যে কোনও বিপর্যয়ের সময়ের সামাজিক অবস্থা। এ নিয়ে কারওকে আলাদা করে দোষ দেওয়ার থাকে না বটে, তবে কিছু মানুষের মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখার জন্য প্রাপ্তির ঘরে সাধুবাদ, পিঠ চাপড়ানি জমে। মানুষ নতুন

অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে শেখেনি বাঙালি, শুধু রাগ-ক্ষোভ উগরে দিয়েই নিজেদের কর্তব্য সমাধা করেছে

কোভিড-১৯, উম্পুন এবং সমকালীন বঙ্গসমাজ

পর্যালোচনা, আত্মসমালোচনা এবং বিশ্লেষণ এখন সব থেকে জরুরি। কিন্তু সে সব ভাবার অবসর বা ইচ্ছা বাঙালির আছে? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

করোনা অতিমারী চলছে চলবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মার্চ মাসেই কেন বাড়ি ফেরানো হল না তা নিয়ে এখন বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে। এরই মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ চলছে না চলবে, তা জানি না। এমন সময় উম্পুন তুফান এসে বাংলা লণ্ডভণ্ড করে দিল। মানুষ এবং সরকারের চাপ আরও বাড়ল। চারিদিকে ইলেকট্রিকের তার ও পোস্ট-ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। বিদ্যুৎ কোম্পানির বিরুদ্ধে জনগণের এমনিতেই বিভিন্ন ক্ষোভ ছিল। আর উম্পুন ঝড়ের পরে পশ্চিমবঙ্গের সহনাগরিকদের আরও ক্ষোভ বাড়ল। রাজনীতিবিদরা যে যার ঘর গুছোচ্ছেন। এর মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের কাজের ভার আরও বাড়ছে। মানুষ থেকে ভিখিরি, অনেকেই

শুভজ্যোতি কাঞ্জিলাল

কালবেলা
#করোনাভাইরাস

লকডাউনের নিয়ম মানছে না। এমন অবস্থায় পথচারী মানুষ এবং ভিখিরি ছাড়া পথচারী সারমেয়র মল পর্যন্ত কর্পোরেশনের সাফাই কর্মীদের পরিষ্কার করতে হচ্ছে।

এই নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বন্ধু যখন বললেন যে তিনি বাঙালি আর ইহুদিদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পান তখন জিজ্ঞেস করলাম দু'টি প্রজাতির মধ্যে 'প্রজাপতি বিস্কুট' ছাড়া কি কেবল একটি বিষয়ে মিল আছে? চোখের চাউনি দিয়ে বলার আগে আন্দাজ করা গিয়েছিল, বাঙালি আর ইহুদিরা নাকি নিজেদের সম্পর্কে প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করে এবং একই সঙ্গে প্রখর নিন্দা করে থাকে। বাঙালি নাকি কাঁকড়ার জাত, অনাবাসীরা নাকি আরও বেশি এই সব আর কী। আমি কইলাম ইয়ার্কি নাকি। তখন সে বলে দেখতে পাচ্ছ না। চোখে ন্যাবা হয়েছে নাকি? আমি বললাম চোখে ন্যাবা-আভা-শোভা এ সব কিছু নয়। তবে এখনও চোখে ছানি পড়েনি। পেটে পানি পড়লেও ছানি পড়ে না।

তখন বললাম যে তবে ইহুদিদের মধ্যে তো লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুটোই বিদ্যমান। ১৯৮০-র দশকে 'আমরা বাঙালি'রা কিংবা 'বাংলার পক্ষে' যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা কেবল লক্ষ্মীছাড়া না হয়ে লক্ষ্মীকে ধরা এবং লক্ষ্মীলাভ ও তার সঙ্গে লক্ষ্মীর যত্ন নেওয়ায় যদি আরও মনোযোগ দিতেন, তা হলে সোনার বাংলা থেকে হিরের বাংলা গড়া আর কে রুখতে পারত? তার মধ্যে একটি মতলব ছিল যেমন ১০০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসকে যদি উনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতেন তা হলে বেশ হত। মানে ১৯১১ সালের ক্যাপিটাল দিল্লিতে চলে যাওয়া আর তার ঠিক ১০০ বছর পর ২০১১ সালে বামফ্রন্ট ও ক্যাপিটাল চলে যাওয়ার একটা রাজনৈতিক ইতিহাস যদি ভাবা যেত তা হলে কেমন হত? আবার ঘটি-বাঙাল, মোহনবাগান-মহান বাগান, ইস্টবেঙ্গলের-কীর্তিপাশা আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চাঁদপাশা, এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর স্পোর্টিং সত্তা মিলিয়ে যে বাঙালি আজ তৈরি হয়েছে এবং মহামারি-হুলচাতুরি-ঝড়ঝড়ানি নিয়ে লড়াই করছে সেইটা বোঝবার মতো ক'টা বাঙালি বাংলায় আজ আছে সেই নিয়ে যদি আর একটু চর্চা হত।

এন কনক

এখন গা বাঁচাতে আর ভাইরাস খুঁজতে গ্রাম-শহর উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করার মত ব্যাপার। কিন্তু তফাৎ, তা একটু বেশি। এখন ভাইরাস এসেছে শহরে আর ভারতের বড় বড় শহর থেকে এখন গ্রামে ছড়ানোর সম্ভাবনা প্রকট হচ্ছে। ভারতের বিশ্ববাজারে সম্মান বাড়ছে না কমছে, এই নিয়ে জোর তর্ক হচ্ছে। তর্কপ্রিয় ভারতীয়র মতো, তর্কপ্রিয় বাঙালির আর কী বা করার আছে?

দোষটা আমাদের মতো কতিপয় শিক্ষকদের। বাঙালিকে বোঝাতে পারিনি যে 'রাজ' ও 'নীতি' শব্দ দুটির মানে পাল্টে গেছে। রাজার নীতি, নীতির রাজা, রাজা-প্রজার দেশ,

> ইকোনমির চাপে, বয়সের ভারে, ছোট ছোট বাচ্চাদের এবং আমাদের মতো বুড়োদের কাঁধে বই এবং ল্যাপটপের ভার নিয়ে বিশ্ব-ঘোরার দিন কি তা হলে শেষ? অ্যাপোক্যালিপস নাকি আসতে চলেছে। তাত্ত্বিকরা বেশ কয়েক বছর ধরে সেই গান গাইছেন। কিন্তু মোদ্দা কথা হল এ সব বাজে তত্ত্ব।

এই সব বোকা-বোকা, আবোলতাবোল কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর কাহাঁতক পারা যায়। ফেসবুক ছেড়ে বুককে ফেস করে জয়গুরু লবঙ্গ চিবিয়ে কবিগুরুর গান গেয়ে গুরুবাদের গুরুত্ব বুঝে, পর্যালোচনা, আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ উদারনীতির আগের ফাইটার আর উদারনীতির পরের ফাইটারদের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। উদারনীতির পরের ফাইটারদের কাছে এখন তো 'রাজ' মানে শাহরুখ খানের হিন্দি ছবির হিরোর নাম আর 'নীতি' অন্য জীবনের, অন্য কোনও নায়িকার নাম। রাষ্ট্রনীতি বলতে গিয়ে আবার বুঝতে পারলাম যে এখন তো রাষ্ট্র বলতে আবার লোকে রাষ্ট্রীয় নামধারী এক সঙ্ঘের কথা বোঝে। জনসঙ্ঘ বা মহাত্মা গান্ধী সঙ্ঘের কথা বুঝবে না। আর প্ল্যানিং ছেড়ে এখন নীতির 'আয়োগ' হয়েছে।

অভিজ্ঞতা যে মানুষকে কী কী শেখায় আর অভিজ্ঞতার মূল্য ঠিক কী তা বাঙালিকে শেখানো যায়নি। গভীরে গিয়ে বোঝা, ভাবা (সরি, পদার্থবিদ হোমি ভাবা বা লিটেরারি ক্রিটিক ভাবা অথবা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবুক সভার ভাবনার কথা বলছি না, মনে করুন সেই বিখ্যাত ডায়ালগ, 'ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো'), ভাবা এবং বোঝা যে দুটোই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত যা 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র মধ্যে এক বৌদ্ধিক উন্মাদনা, তার কথা বলছি।

সত্যজিৎ রায়ের স্ক্রিপ্ট লেখা 'বাক্সবদল' ছবিতে মনোরোগের ডাক্তার তার পেশেন্টদের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করে, আজকের বাঙালি কি সেই যুগের ডাক্তার হতে পারবে? ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এলে পোস্ট-কোভিড-১৯ পশ্চিমবঙ্গের মেন্টাল হেল্‌থ নিয়ে কি শুধু গবেষণা হবে, চর্চা হবে, নাকি তত্ত্বের সঙ্গে একটু প্র্যাকটিসও হবে? পাবলিক হেল্‌থ তো হল, মেন্টাল হেল্‌থটার কি হবে?

দিল্লিনিবাসী এক বাঙালি বন্ধু মাঝে মাঝে মা-কে দেখতে এসে এই আবদার করে যে কলকাতায় এত 'তার' কেন? আমি বললাম ঠিকই তো— কলকাতাকে কি আমরা 'কেবল্ড সিটি' হিসেবে পরের প্রজন্মের কাছে রেখে যাব? তার প্রস্তাব হল মাটি খুঁড়ে আবার কেবলের তার, ফোনের তার ইত্যাদি মাটির ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া। ওয়্যারলেস করতে গিয়ে রেডিয়োঅ্যাক্টিভ ওয়েভস নিয়ে যে কাণ্ড হচ্ছে আর তার পর ৪জি থেকে ৫জি করতে গিয়ে যে 'বেওসা' যুদ্ধটা হবে, তার পর যে কী হবে তা এই সাধারণ শিক্ষকের জানা নেই। চন্দ্রবিন্দুর 'আর জানি না' গানটাই যা ভরসা।

তারঁকাটা পাগলের কথা বন্ধু বলছিল না। কাজপাগলের কথাও সে বলছিল না। বাঁদর-ত্যাঁদড়ের কথাও সে বলছিল না। সে একটি সহজ কথা বলছিল। কন্সট্রাক্টিভ সাজেশন। তার কথা কি আমরা শুনব? নাকি আগে থেকে তার গায়ে লেবেল সেঁটে দেব যে উনি তো আসলে অমুক দলের হয়ে প্রচার করেন বা অমুক সরকারের দিকে ঝুঁকে থাকেন। 'নিওলিবারেল সাবজেক্ট' প্রতিযোগিতা পছন্দ করে। কিন্তু কী হবে এত প্রতিযোগিতা করে? সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর'-এর মহানগরীতে যেখানে লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত কাজের চাপে বা কাজ খোঁজার খোঁজে নিত্য দিন কাজ খুঁজতে বেরোয়, আমাদের জেনারেশন কি সেগুলো শিখলাম? দাদু-দিদিমা-বাবা-মা বেঁচে থাক। তাঁদের প্রজন্ম আর আমাদের প্রজন্মের মধ্যে কোনও তুলনা হয় না।

ইকোনমির চাপে, বয়সের ভারে, ছোট ছোট বাচ্চাদের এবং আমাদের মতো বুড়োদের কাঁধে বই এবং ল্যাপটপের ভার নিয়ে বিশ্ব-ঘোরার দিন কি তা হলে শেষ? অ্যাপোক্যালিপস নাকি আসতে চলেছে। তাত্ত্বিকরা বেশ কয়েক বছর ধরে সেই গান গাইছেন। চাঁদে জল খুঁজে পেলে বড়লোকেরা হয়তো ভবিষ্যতে চলেই যেত। উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর কথা হচ্ছিল না। কিন্তু মোদ্দা কথা হল এ সব বাজে তত্ত্ব।

পুঁজিবাদের সঙ্গে আমাদের দেশে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ বাড়বে না কমবে, সেটাই দেখার। পুঁজিবাদী সিস্টেমে মালিক পক্ষ আর শ্রমিক পক্ষ থাকে। বামপন্থী মানুষ চিরকাল শ্রমিক পক্ষের হয়ে কথা বলে, দাবি করে, লড়াই করে। কারণ বামপন্থী পার্টির মালিক কোনও নবাব সাহেব নয়। কোনও লাটসাহেব নয়। বামপন্থী পার্টি শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। মালিক শ্রেণির নয়। সেই পার্টি 'পার্টি' ছবি দেখে হবে না। পার্টি দিয়েও হবে না। শুধু পাটিগণিত দিয়ে হবে না। পার্টিটা সিরিয়াসলি করতে হবে। বিংশ শতাব্দীর পার্টি নিয়ে আজ বাঙালি বাঁচবে না। এটা বাস্তব। একবিংশ শতাব্দীর জন্য একবিংশ শতাব্দীর পার্টি দরকার। বিজেপি এখানে বিরোধী আসনে বসলে রাজ্যটা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। আর মুত্তাহিদা ইত্তেহাদুল মুসলিমিন, যাদের নাম উচ্চারণ করতে বাঙালিদের দাঁত ভেঙে যায় তারা বিজেপিকে জিতিয়ে দেওয়ার তাল করছে। ক্লাস বুঝতে হবে। দোষ আমাদের মতো শিক্ষকদের। শেখাতে পারিনি। লিখতে পারিনি। বোঝাতে পারিনি।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক